দুই ক্ষুদ্র ঈশ্বর

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

ফাদার পিয়ের ফালোঁকে এক সময় শহরের কোথায় না কোথায় দেখা যেত জেজুইট পাদ্রির সম্ভ্রান্ত পরিধানে এক ঝড়ঝড়ে সাইকেলে চেপে আপনমনে চলেছেন, ততটা ট্রাফিক নজর করে নয় যতটা দর্শন কিংবা ধর্মীয় তত্ত্বের কোনো গূঢ় সমস্যা নিয়ে মাথা খাটাতে খাটাতে। একদিন ক্লাসের পর বলেই ফেলেছিলাম, ফাদার, আপনি কেন ফাদার আঁতোয়ানের মতো একটা মোটর বাইক নিয়ে নেন না?

ফাদার ফালোঁর একটা অভ্যাসই ছিল কিছু ভেবে বলার সময় ওঁর থুতনির সোনালি ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িটায় হাত বুলানো। উনি তাই করতে করতে এক উন্মনা চাহনি আর স্বরে বললেন, তার মানেই তো স্পিড, আরও স্পিড। তাহলে মনটা তো সারাক্ষণ ট্রাফিক দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ভাববটা কখন? একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হয় ঠিকই, তবু আমার এই ছ্যাকরা সাইকেলই ভাল।

এই কথাটাই আরেকদিন বলেছিলাম ফাদার রবের আঁতোয়ানকে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে ওঁর দোতলার আস্তানায়। বইপত্তর ছড়িয়ে খাটের ওপর বসে চুরুট খাচ্ছিলেন ফাদার। কথাটা শুনেই ঠোঁটের চুরুট অ্যাসট্রেতে নামিয়ে রেখে বললেন, কলকাতার রাস্তা কি গভীর ভাবনা করার পক্ষে খুব উত্তম জায়গা? এই সেদিনই তো সাইকেল নিয়ে কোথায় কী ধাক্কা খেয়ে ফালোঁ বিছানা নিলেন।

এই সাইকেল আর বাইক প্রীতির মধ্যে দুই অসাধারণ মানুষ ও পণ্ডিতের চরিত্রের লক্ষণ লুকিয়ে আছে। ফাদার আঁতোয়ানের মধ্যে ওঁর গ্রিক সাহিত্য ও দর্শন চর্চার গাঢ় ছাপ ছিল, পরে সংস্কৃতে পণ্ডিত হয়ে ন্যায় বা লজিক, তন্ত্র বা সিস্টেমে চিন্তা করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন, সব কিছুকে গ্রিকদের মতো syllogistically ভেঙ্গে দেখার একটা প্রবণতা ছিল। ফাদার ফালোঁ সেদিক দিয়ে ছিলেন হৃদয়বাদী, ওঁর প্রিয় দার্শনিক ছিলেন পাস্কাল। আমাদের মরাল সায়েন্স পড়াতে এসে কী এক প্রসঙ্গে অপূর্ব অনুভূতির সঙ্গে উদ্ধৃতি দিলেন পাস্কালের 'পঁসে' থেকে : Le coeur a ses raisons que la raison ne connait point. অর্থাৎ হৃদয়ের কিছু যুক্তি থাকে যা যুক্তির বাইরে। ওঁর পড়ানোর ধরনের মধ্যেই একটা খোঁজ, রহস্যের সন্ধান, কিছু একটা হাতড়ানোর ব্যাপার। উনি পড়াতেন ভাবতে ভাবতে, ছাত্রদের বোঝানোর

পাশাপাশি নিজেকেও কিছু বোঝাবার চেষ্টায় থাকতেন। পরে জেনেছিলাম পড়ানোর এই স্টাইলটাই নাকি ছিল দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের।

আমাদের খুব অবাক লাগত ফাদার ফালোঁ বা ফাদার আঁতোয়ান কেন সেন্ট জেভিয়ার্সের সন্ন্যাসীদের নিবাসে থাকেন না। আঁতোয়ান সাহেব কালীঘাটের এক বাড়িতে থাকতেন আগেই বলেছি, ফালোঁ থাকতেন উত্তর কলকাতার এক পুরোনো গলি তেলিপাড়া লেনের ছ-নং বাড়ির দোতলায়। চারদিকে সারাক্ষণ গলির বাংলা ছুটছে, আর তার মধ্যে বেজায় পুরোনো আর একশ ডুমের আলোয় কোনো মতে আলোকিত একটি ঘরের মধ্যে কী শান্তিতেই না ন্যস্ত থাকতেন সাহেব। ঈশ্বর বাদ দিলে ওঁর ভালবাসার জিনিস বলতে দুটোই— মানুষ আর বই। সারাজীবন ভদ্রলোকের চেষ্টা ছিল সাধারণ বাঙালির মতো সাধারণ হয়ে যাওয়ার। তেলিপাড়া লেনের বাড়িটাকে 'আমার ঘর' বলে উল্লেখ করতেন বেশ গর্বের সঙ্গে।

ফাদার ফালোঁ-র রহস্যপ্রীতির কথা একটু বলি। সে-সময় শহরে মুক্তি পেয়েছে সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিটা। পড়াতে পড়াতে perfection -এর সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে ছবিটার উল্লেখ করলেন ফাদার। বললেন, শিল্পের এক মস্ত দাবি হল পার্ফেকশন। নিখুঁত ও পরিপাটি হওয়া শিল্পের এক ধর্ম। তবে খুব নিখুঁত কিছুর মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতাও থাকে, কারণ অনেক সময়ই তা রহস্যবোধের হানি করে। নায়ক-এও করেছে। সে তুলনায় ইঙ্গমার বার্গমানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ'-এ রহস্য অনেক গভীর, এর জিজ্ঞাসার শেষ নেই। তবে সত্যজিৎও রহস্য বোনেন, অপু ত্রয়ীতে।

ফাদার খুব মুগ্ধ ছিলেন আলব্যের কামু-তে। বলেছিলেন সার্ত্র এবং কামুর মধ্যে নিঃসঙ্কোচে বেছে নেব কামুকে। তাই ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে প্রেসিডেন্সির ইংলিশ সেমিনারের হয়ে নাটক প্রযোজনার সময় দ্বারস্থ হলাম ফাদারের। কারণ নির্বাচিত নাটকটি কামুর 'ল্য মালঁদঁদু'-র ইংরেজি অনুবাদ 'ক্রশ পার্পস'। মনে আছে ফাদার ওঁর ব্যস্ত জীবন থেকে ফি সপ্তাহ দু-দিন করে সময় বার করে প্রেসিডেন্সির ইংলিশ সেমিনার রুমে চলে আসতেন এবং দিব্যি দু-ঘন্টা করে পড়ে পড়ে বোঝাতেন কোনখানটায় কী ভাবে যেতে হবে। নাটকের শেষ একটি এক-শব্দের সংলাপ দিয়ে— No! না! এই না-টা কীভাবে বলা হবে তা নিয়ে যে ডিটেল আলোচনা করলেন একদিন তা বিস্ময়কর। বললেন, এ এক নির্মোহ, কিছুটা নির্মম 'না', যেন ঈশ্বর বা নিয়তির কণ্ঠস্বর। এই 'না' ভয়, হতাশা ও নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করে। আর অনেকটা ক্লান্তিও।

বলতে বলতে ফাদার উঠে দাঁড়িয়ে সেই হতাশার 'না'-টা উচ্চারণ করলেন, তারপর ক্লান্তভাবে বসে পড়লেন হাতের বইটা টেবিলে রাখতে রাখতে।

এইখানে মনে আসছে ফাদার আঁতোয়ানের বাড়ির এক সন্ধ্যা, আমি দুই সাংবাদিক বন্ধু বিক্রমন নায়ার ও সত্য সাঁইকে নিয়ে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। আমরা তখন উদ্যোগ করছি ফাদারের করা ভার্জিলের 'ইনিড'-এর বঙ্গানুবাদ বার করব। সে-অনুবাদের প্রথম খণ্ড তদ্দিনে বেরিয়েছে, আমরা দ্বিতীয় খণ্ড থেকে বাকি কাজটুকু করব ঠিক করেছি। কিন্তু ফাদার দেখলাম 'ইনিড'-এর চেয়ে ঢের বেশি কথা বলেন বেদব্যাসের মহাভারত আর কালিদাসের শকুন্তলা

নিয়ে। বলতে বলতে মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনায় গেলেন, আর ইলিয়াড ও মহাভারতের যুদ্ধের দৃশ্যের তুলনা করা শুরু করলেন। এখনও ছবির মতো মনের চোখে ভাসে ওঁর সেই আবেগে উষ্ণ সৌম্য মুখটা যখন মহাভারতের যুদ্ধের একদিনের সমরক্ষেত্রের বর্ণনা দিচ্ছেন। যখন বললেন, ক্ষেত্রময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য মৃতদেহ, কাটা মুন্ড যেন পানপাত্র, তা থেকে রক্তের ধারা যেন লোহিত পানীয়, মৃত মানুষের দেহ বা দেহাংশ যেন ভোজের খাদ্য, অসি ঢাল তির ছুরিকা ইত্যাদি সে-খাদ্য পাক বা ভোজনের যন্ত্র, সমস্ত ক্ষেত্রটি যেন যমের ভোজসভা। যার ফরাসি অনুবাদে ব্যবহার করা হল এক অনুপম expression— Cabaret du mort! মৃত্যুর ভোজসভা!

শুধু বলেই ক্ষান্ত নন ফাদার, এবার তিনি স্মৃতি থেকে সেই পঙক্তি সব আবৃত্তি শুরু করলেন, তাঁর খাটটি তখন যেন নাট্যমঞ্চ, আমরা তিন বন্ধু তিন ভূতে পাওয়া শ্রোতা, নাকি দর্শক? কতক্ষণ চলেছিল মহাভারত ও ইলিয়াডের যুদ্ধের বর্ণনার কখনও পাঠ, কখনও আবৃত্তি মনে নেই, শুধু মনে করতে পারছি বীর হেক্টরকে অদ্বিতীয় আর্কিলিসের তাড়া করা বর্ণনা করতে গিয়ে ফাদার উত্তেজনার বশে তাঁর সেই জলচৌকির ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন আর যুদ্ধ প্রসঙ্গ শেষ করার পর ফের বসে, একটু দম নিয়ে, বলেছিলেন— সাধে ট্র্যাজেডিকে অ্যারিস্টটল বর্ণনা করেছিলেন 'ফিলোজফোতেরন কাই স্পুদাইয়োতেরন' বলে? যার মানে কী জানো? More philosophic and more serious.

সে-রাত্রে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমরা আলোচনা করেছিলাম কাকে পড়ানো বলে। অথবা তিনজনই একমত হয়েছিলাম যে, পড়ানো হওয়া উচিত এরকমই, শিশুর হাতের টিকার মতো বরাবরের মতো বসে যাবে মনে। যাতে উচ্চারণ, আবৃত্তি, নাটক, পাঠ, পাণ্ডিত্য ও বিদ্যা দান মিশে থাকবে। যা হবে চিরকালের স্মৃতি। ফাদার আঁতোয়ানের সেদিনের আলোচনা, পাঠ, শিক্ষকতার মতো। শেষে বিক্রমন নায়ার বললেন, এই সব লোকের কাছে পড়তে পারলে সারাজীবন ছাত্র হয়ে থাকা যায়।

আমি কিন্তু কলেজে ফাদার আঁতোয়ানের ছাত্র ছিলাম না, ছিলাম ফাদার ফালোঁ-র। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর কী করে, কী করেই যেন দু-জনারই ছাত্র থেকে গিয়েছিলাম, তাতে আরেকটা ধারণাও ক্রমশ দৃঢ় হল ঃ ফাদার ফালোঁ ও ফাদার আঁতোয়ান দুজনাই পকেটে একেকটা ক্লাসরুম নিয়ে ঘোরেন। প্রথম জনের ক্লাসরুম পড়ানো থেকে খুব কৌতূহল জন্মেছিল এক লেখকের প্রতি— তেইয়ার দ্য সারদ্যাঁ। কিন্তু কলকাতার নানা বইয়ের দোকানে ঢুঁ মেরেও খালি হাতে ফিরতে হল, কলকাতায় কারও কাছে বই দূরস্থান লেখকটির নামও নেই। তখন ফের শরণ নিলাম সেন্ট জেভিয়ার্সের সন্ন্যাসীদের লাইব্রেরির। তারপর বইটা পড়ে ফেরত দেওয়ার পর ছুটলাম তেলিপাড়া লেনে। গলি দিয়ে ঢুকতেই সন্ধ্যের মুখে ফাদারের সঙ্গে দেখা, বোধহয় ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিয়ে ফিরছেন। আমি তেইয়ার দ্য সারদ্যাঁ-র বইয়ের কথা তুলতেই সাইকেল থেকে নেমে একটা চার্মিনার ধরিয়ে মানুষের বিবর্তন, মানুষের অবস্থা, তেইয়ারের ভূতাত্ত্বিক গবেষণার কথা বোঝাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বললেন,

তুমি তো সিগারেট খাও; খাচ্ছ না কেন? এভাবে কথায় কথায় সিগারেট আর ক্লাস চলল। এক সময় ওঁর খেয়াল হল Vespers বা সান্ধ্য প্রণাম জানিয়ে ফেলেছি। ফাদার ফালোঁ ও ফাদার আঁতোয়ানকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বড় আনন্দ পেতাম।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের কাছেই একটা বড়ো পুজো হয় জগদ্ধাত্রী দেবীর। একবার সে পুজোর সংগঠকরা এসে বলল তারা পুজোর পর স্থানীয় দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করতে চায়। এবং সেই বিতরণী সভার উপযুক্ত একটা আলোচনার বৈঠক চায়। কী করার? আমি সে-সময়ে সামান্য সামান্য করে মাথা চাড়া দেওয়া সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কথা ভেবে বললাম একটা পার্লামেন্ট অফ রিলিজনজ গোছের কিছু করতে, যেখানে নানা ধর্মের মানুষদের বক্তব্য শোনার সুযোগ হবে। শেষে বক্তা হিসেবে ঠিক হলেন মুসলিম ধর্মের পক্ষে একজন উলেমা, নাস্তিকতার পক্ষে মার্ক্সবাদী বন্ধু বিক্রমন নায়ার, হিন্দু ধর্মের পক্ষে কবি কবিতা সিংহ এবং খ্রিস্টান ধর্মের পক্ষে ফাদার আঁতোয়ান। ফাদারের সময়ের টান ছিল বলে তিনি প্রথমেই বলে চলে যান, কিন্তু এমনই অপূর্ব এক বক্তব্য রেখে গেলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতেও অন্য সব বক্তা বার বার ওঁর কথার, যুক্তির, পাণ্ডিত্যের উল্লেখ করলেন। মুসলিম ভদ্রলোক তো পরিষ্কার বললেন, ফাদার তো খ্রিস্টান ধর্ম নয়, আমাদের সবার হয়েই বক্তব্য রাখেলেন। মঞ্চ থেকে নেমে নায়ার বললেন পুজোর এক কর্তাব্যক্তিকে, ফাদার খ্রিস্টান, কিন্তু আপনাদের কোনো পুরোহিত ওঁর নখের যোগ্য সংস্কৃত জানেন না। একবার ওঁকে দিয়ে আপনাদের পুজোপাঠ করান তাহলে বুঝব আপনাদের বুকের পাটা আছে। পরে একথা শুনে ফাদার বেশ হেসেছিলেন। তারপর বললেন না, না, তোমরা এমন কথা বলো না। সব ধর্মের সব আচারের পিছনে একটা বিশ্বাস কাজ করে। তাতে আঘাত করতে নেই।

ফাদার ফালোঁ ছিলেন বড়োসড়ো দেহের, আঁতোয়ান ছোটোখাটো। ফালোঁ-র মাথায় বড়োসড়ো টাক, আঁতোয়ানের মাথা জোড়া কোঁকড়া চুল। পাদ্রি হিসেবে দুজনাই খুব চোখকাড়া। তবে দুজনেরই আসল ক্যারিসমা ধরা পড়ত ওঁরা কথা শুরু করলে। প্রথম জনের বুলি লিরিকাল, দ্বিতীয় জনের তার্কিক গদ্য। কিন্তু দুজনেরই কথায় ভর করত বিস্তীর্ণ ও গভীর পড়াশুনো, আর এক অপূর্ব ভালবাসার ছোঁয়া। ঈশ্বরের ধ্যানে মজা দুই সন্ন্যাসীর কাছেই বই ছিল ঈশ্বরের এক রূপ বা গুণ। সেন্ট অগাষ্টিন যেমন বলেছিলেন যে Time বা কাল হল God বা ঈশ্বরের এক attribute বা গুণ। ফালোঁ বা আঁতোয়ান গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারতেন যে Book বা বইও তাঁর এক attribute.।

এই দুই সন্ন্যাসীই আমার কাছে দুই ক্ষুদ্র ঈশ্বর।